ভারতীয় বর্ণ-জাতি প্রথার ইতিবৃত্ত

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সভ্যতার অগ্রযাত্রার প্রায় প্রারম্ভলগ্ন থেকেই বিভিন্ন বহিরাগত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতের মিথষ্ক্রিয়ায় সনাতনপন্থীদের মধ্যে বর্ণপ্রথার উত্থান ঘটেছে। এতদঞ্চলের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ও ব্যতিক্রমী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো বর্ণপ্রথা। বর্ণ থেকেই এতদঞ্চলের বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় আবহে পরবর্তীকালে জাতিপ্রথার উদ্ভব ঘটেছে। ভারতীয় জনমানসে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিতশ্রেণি ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পরিশ্রমের কাজে খাটিয়ে স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের পাশাপাশি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণ-জাতিপ্রথাকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের জন্য সনাতন ধর্মেও চারটি বর্ণ ও অজস্র জাতিতে বিভক্ত প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রবণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত সহজাত গুণের ভিত্তিতে সমাজকাঠামোর অন্তর্গত হয়। এ প্রবন্ধে ভারতীয় বর্ণ-জাতি প্রথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আড়াই হাজার বছর ধরে জনজীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে একদিকে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ, বিপরীতক্রমে রয়েছে সামাজিক প্রতিবেশে সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় গোষ্ঠীর মর্যাদালাভ ও ক্ষমতার মানদণ্ডে সমাজ কাঠামোর শীর্ষভাগে অবস্থান গ্রহণের প্রসঙ্গ। এমনকি আধিপত্য ও অধীনতার যুগ্ম-বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক, ধর্মীয় সূত্রে গ্রন্থিত কর্তৃত্ব প্রকাশ ও মান্যতা প্রভৃতির পাশাপাশি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের মনোভঙ্গিগত স্বরূপও বর্ণপ্রথার দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। রণজিৎ গুহের মতে, সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের জীবনযাত্রার সামূহিক বিপর্যয় ও সামাজিক নিম্নাবস্থানকে চিহ্নিত করতে ব্রাহ্মণ্যবাদী এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও তৎপরতা অনস্বীকার্য (গুহ ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪: ৬৭)। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন, 'বর্ণব্যবস্থাকে পরিবেষ্টন না করে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যাই শ্রুতির দাবি করতে পারে না' (হাবিব, ২০০৬: ১৫১)। তাঁর মতে, 'বর্ণ হলো সুস্পষ্টভাবে সুচিন্তিত ও পৃথকীভূত এক গোষ্ঠী যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে অন্তর্বিবাহসূত্রে (পুরুষের ক্ষেত্রে বহির্বিবাহ) এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বংশানুক্রমিক, প্রকৃত অথবা প্রস্তাবিত পেশা অথবা কর্তব্যের বন্ধনে পরস্পরের সাথে যুক্ত' (হাবিব, ২০০৬: ১৫১)। বর্ণের উদ্ভব সম্পর্কে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী *An Introduction to the Study of Indian History* গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস-পরিক্রমায় উপজাতীয় উপাদানগুলিকে সাধারণ সমাজে একীভূত হয়ে যেতে দেখা যায়। এই ঘটনা ... ভারতবর্ষের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সামাজিক বৈশিষ্ট্য, যেমন বর্ণ, সেটির মূলে নিহিত' (হাবিব, ২০০৬: ১৫৪)। তিনি মনে করেন, বর্ণ পরিকাঠামোতে ব্রাহ্মণকুলের অবস্থান, স্বভাবতই অধিক পরিমাণে তাদের পৌরোহিত্যমূলক কাজে ও বর্ণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অভিভাবকত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল (হাবিব, ২০০৬: ১৫৬)। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বর্ণব্যবস্থাকে সার্বজনীন করে তোলার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকুল মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্যগুলো (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৫: ২০) হলো—

১. বর্ণ জন্মগত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।
২. ভিন্ন বর্ণে বিবাহ-সম্পর্ক নিষিদ্ধ।
৩. কোনো ব্যক্তির বর্ণ অপরিবর্তনীয়।
৪. উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের আহার, বিবাহ, সামাজিক আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, একত্রে শিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতির ওপর বিশেষ বিধিনিষেধ প্রচলিত (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১: ১১)।
৫. প্রত্যেকটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ ব্যতীত) একটা বিশাল শ্রেণি গড়ে তোলে, যার অন্তর্গত হয় বিভিন্ন জাতি (হাবিব ও ঠাকুর, ২০০৬: ৭৪)।
৬. বর্ণে সুনির্দিষ্ট ক্রমোচ্চবিন্যাস সর্বদাই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যার শীর্ষ অবস্থানে ব্রাহ্মণ, এরপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও তলদেশে শূদ্রের অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে। কোনোভাবেই এ কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব নয়।
৭. প্রতি বর্ণের ধর্ম, কর্তব্য ও বৃত্তি সুনির্দিষ্ট; তবে জরুরি অবস্থায় ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য।

তাত্ত্বিকভাবে 'বর্ণ' শব্দের অর্থ হলো 'গুণ'। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের চারটি বর্ণ ও বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রবণতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশিত সহজাত গুণের ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ও

বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮: ২০)। *ঋগ্বেদের* যুগে সমাজে বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মভেদের প্রয়োজনেই বর্ণপ্রথার উদ্ভব হয়। শুরুতে তা বংশগত ছিল না, বরং ছিল গুণ ও কর্মগত। *শ্রীমদ্ভগবতগীতায়* এ ব্যাপারে উদ্দীষ্ট বক্তব্য হলো– 'বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু আমি এর সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলে জেনো' (জলদাস, ২০০৮: ২)। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণের অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে তিন ধরনের গুণের উল্লেখ রয়েছে। যথা– সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে সত্ত্বঃ গুণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে রজঃ গুণ, বৈশ্যের ক্ষেত্রে রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের সমন্বয় এবং শূদ্রের ওপর তমঃ গুণ আরোপ করা হয়েছে। চতুর্বর্ণের মতো তিনটি গুণের সঙ্গে রঙ বা বর্ণের সাংকেতিক সম্পর্ক রয়েছে। শ্বেত বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সত্ত্বঃ, লালের সঙ্গে রজঃ, আর কালোর সঙ্গে তমঃ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত–

> সত্ত্ব, রজ এবং তম-র যে গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। বলা বাহুল্য, এই শব্দগুলির ইংরেজিতে উপযুক্ত প্রতিশব্দও নেই। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং এগুলির অন্তর্ভুক্ত নানা বৈশিষ্ট্য আর তাই একটা সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্য বোঝান কঠিন অথবা এই তিনটি গুণকে একটি সরল রেখার মতো সম্পর্কে আনাও যুক্তিযুক্ত নয়। আর যেহেতু এক একটি গুণের বৈশিষ্ট্য অনির্দিষ্ট তাই ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এক একটি গুণ বিভক্ত সে বিষয়ে মতানৈক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক (বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৬ : ৪৮)।

'সত্ত্বঃ' শব্দটির একটি অর্থ শুচি বা পবিত্র। তবে এর দ্বারা অন্য অর্থও নির্দেশিত হয়। যেমন– সত্য, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি। সেকারণেই উক্ত শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো জটিলতা সৃষ্টি হয়। সাধারণত শুচিতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, ইত্যাদি সত্য-জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুষঙ্গবাহী ভাব হিসেবে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। তাই কোনো ব্রাহ্মণ ধর্মাচরণের জন্য উচ্চ শ্রেণি দাবি করলেও আরেকজন জ্ঞানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'রজঃ' বলতে বোঝানো হয় শৌর্য-বীর্য, বাহুবল, পৌরুষ বা কর্মসামর্থ্য। ক্ষমতায় আসীন শাসকদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'তমঃ' শব্দের অর্থ হিসেবে অন্ধকার ব্যতীত আরেকটি ধারণা হলো অশুচিতা বা অপবিত্রতা। এ শব্দের প্রয়োগ ঘটে সাধারণত শূদ্রদের ওপর, যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শ্রমজীবী অংশ; ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় রীতি ও আদেশের দ্বারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত। সমালোচকের অভিমত–

> সাধারণ জীবনে তিনটি গুণগত বৈশিষ্ট্যের অবস্থান কোথায় তা নির্ধারণ করা কঠিন। ধর্মগ্রন্থগুলিতে সত্ত্বকে সব চাইতে গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ এই গুণের অধিকারী ব্রাহ্মণ। এই গুণগুলির লেখকরাও ব্রাহ্মণ তাই হয়ত সত্ত্ব-র প্রাধান্য এত বেশি। তবে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ ঠিক কিভাবে সত্ত্ব ও রজঃ বর্ণ নির্ধারণ করেন তা বলা কঠিন। তবে তমঃ সম্পর্কে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় না কারণ এই তিনটি বিশেষ গুণে কেবলমাত্র মানব নয়, যাবতীয় জীব এবং পদার্থকে চিহ্নিত করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ৪৮-৪৯)।

হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, *ঋগ্বেদের* সময়ে বা তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বর্ণ বিভাগগুলো বংশগত অথবা বংশকুলের মধ্যে বিবাহ দ্বারা আবদ্ধ স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ছিল না। তাই যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই পৈতৃক পেশা ব্যতীত ভিন্ন পেশা ও বর্ণ অবলম্বন সম্ভব ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, মহাজ্ঞানী ভৃগু স্ত্রোত্র রচনা করলেও এবং তার বংশধরেরা রথ নির্মাণে পারদর্শী হলেও এটি ছিল প্রধানত বৈশ্যদের পেশা। বিশ্বামিত্র, দেবপি, গর্গ, সুদ গলা, হারীত, কম্ব প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজাগণ ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে পরশুরাম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্রাহ্মণরা অবলম্বন করেছিল ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি। বৈশ্যরাও ব্রাহ্মণ হয়েছিল, যেমনটা ঘটেছিল নভগরিষ্ঠের দুই পুত্রের ক্ষেত্রে (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮ : ২০)। পৌরাণিক যুগে বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে যায় এবং আর্য সমাজের মূল ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয় (দেবনাথ, ২০০১: ৬৭-৬৮)। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের পর সেন যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজাদের শাসনকালে সনাতন ধর্মকে কঠোরতম অনুশাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ মানুষকে বর্ণপ্রথার জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়।

ভারতীয় জনমানসে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই এতদঞ্চলে ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিতশ্রেণি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পরিশ্রমলব্ধ কাজে খাটিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের পাশাপাশি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে। তারা এক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের প্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্র, ধর্মীয় গ্রন্থ, পুরাণ ও সংহিতাসমূহকে। বর্ণপ্রথার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সমর্থন ও উল্লেখ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে *ঋগ্বেদের* 'পুরুষ সূক্তে'র পরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত *গীতা*। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মতে, *গীতা* স্বয়ম্ভূ, স্বতঃপ্রসারী, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বয়ং ভগবানের মুখের বাণী। *মহাভারতে* কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন। এসবের সারসংক্ষেপই *গীতা* (দেবনাথ, ২০০১: ৫০)। সমাজবিজ্ঞানী জয়নাল্লুজ বন্দ্যোপাধ্যায় *সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতা* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণপ্রথা *গীতার* দ্বারা প্রচারিত এবং সমর্থিত। অর্জুন কেন যুদ্ধ করবেন না,

তার কারণ হিসেবে বর্ণসঙ্করতার ভয়াবহ প্রসঙ্গ তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। এর প্রতিকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, যুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার জন্য আবশ্যক। কারণ, বর্ণপ্রথায় ক্ষত্রিয়ের দায়িত্ব সুচারুভাবে যুদ্ধ করা। *গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি জানিয়েছেন, চর্তুবর্ণ সমাজ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরো জানিয়েছেন যে তাঁকে আশ্রয় করেই স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র – এসব পাপযোনি পরম গতি পায় (দেবনাথ, ২০০১: ৫১)। আধুনিক যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, সচেতনমানসে মানুষ সম্পর্কে এমন অবমাননাকর ভাবনা কখনোই গ্রহণযোগ্য, সমর্থিত হতে পারে না। স্পষ্টতই বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানকে আশ্রয় করে *গীতার* রচয়িতাগণ সুকৌশলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জয়নান্তুজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন–

> গীতার শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র মাত্র, ঈশ্বরের অবতার অথবা অন্য কোন ঐতিহাসিক মানুষ নন। জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতার ফলে সমকালীন আর্যসভ্যতা যে গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলো, সে ঐতিহাসিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে একদিকে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, ম্লেচ্ছ তথা ভূমিপুত্র অনার্যদের বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্ম এবং নাস্তিকতাবাদের কঠোর সমালোচনা করে, আর তা আরোপিত হয়েছিল শ্রীভগবান চরিত্রের মুখে। গীতাকারদের আশা ছিলো যে এভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের টোটাল আইডিওলজিকে, বিশেষত চাতুর্বর্ণ্য এবং শূদ্র ও নারীর হীনস্থান আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব এবং আর্থিক শোষণকে বিস্তারিত এবং চিরায়িত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ গীতার শ্রীভগবান শুধু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণী দ্বারা আবিস্কৃত এবং প্রতিষ্ঠিত শোষণ-শাসনের ধর্মীয় হাতিয়ার মাত্র (দেবনাথ, ২০০১ : ৫১)।

হরিবংশে বর্ণিত হয়েছে– অক্ষর হতে ব্রাহ্মণরা, ক্ষর হতে ক্ষত্রিয়রা, বিকার হতে বৈশ্যরা, ধূমবিকার হতে শূদ্ররা উৎপন্ন (দেবনাথ, ২০০১: ৫)। *মহাভারতে* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নারায়ণের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ থেকে অন্যান্য বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে (দেবনাথ, ২০০১: ৫)। *পদ্মপুরাণে* বর্ণিত হয়েছে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে সৃজন করেছিলেন, পরবর্তীকালে পৃথক অন্যান্য বর্ণ তাঁদেরই বংশে উৎপন্ন হয়েছে (দেবনাথ, ২০০১: ৫)। বর্ণপ্রথা সম্পর্কে সবচেয়ে কঠোর ও অনড় মনোভাবাপন্ন অবস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনুর ভূমিকা সর্বাধিক। মনুবাদের দ্বারাই বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজে বিষবৃক্ষের শিকড়কে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। হিন্দু সমাজ কীভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে, সেই বিধান মনুরই নির্দেশিত, যা *মনুসংহিতা* নামে

পরিচিত। একে বিবেচনা করা হয় প্রাচীনতম ও প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র তথা সনাতনপন্থীদের সংবিধান হিসেবে। এ গ্রন্থে সনাতন সমাজ ও পরিবার সম্পর্কিত বিধিসমূহের পাশাপাশি বর্ণপ্রথা ও বর্ণসঙ্কর তত্ত্বের স্বরূপ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নির্দেশিত হয়েছে (বিশ্বাস, ২০০৭: ১০২)। বর্ণপ্রথার বিকাশে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে *মনুসংহিতার* দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বর্ণসঙ্করতার তত্ত্ব, যার রচনাকাল আনুমানিক পঞ্চম শতক বলে রামশরণ শর্মা মনে করেন (শর্মা, ১৯৯৯: ৩০৭)। এ তত্ত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ রীতি। এ প্রথার মাধ্যমে উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন জাতির, যারা বর্ণ ও জন্মগত কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা নির্বিচারে শূদ্র হিসেবে অন্তর্গত হয়েছে; এরপর এর চেয়েও নিম্ন সামাজিক অবস্থানে এদের অনেকেরই অবনমন ঘটেছে অস্পৃশ্য হিসেবে। তারই সামগ্রিক পরিণতিতে সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণির সমান্তরালে সুবিধাবাদী ও প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জোটের অবস্থান হয়েছে আরো সংহত, দুর্লঙ্ঘ্য। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বর্ণপ্রথা ও বর্ণসঙ্কর তত্ত্বের মাধ্যমে মনু ভারতবর্ষের সমগ্র জনসমাজকে ব্রাহ্মণবাদের কাঠামোভুক্ত করতে সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে তার হাতিয়ার হলো অসবর্ণ বিবাহ, যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। মনুর দৃষ্টিতে বিবাহের প্রকারভেদ অনুযায়ী জাতকের জাতি বিচার নিম্নরূপ–

ক. সবর্ণ বিবাহ : সন্তানের জাতি পিতা-মাতার অনুসারী।

খ. অসবর্ণ বিবাহ (অনুলোম পদ্ধতি): প্রথম তিন বর্ণের পুরুষের সঙ্গে যদি পরবর্তী নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ হয়; যেমন– ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় + বৈশ্য, বৈশ্য + শূদ্র– এই প্রকার বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তান পিতার জাতিভুক্ত বলে গণ্য হবে।

গ. অসবর্ণ বিবাহ (অনুলোম পদ্ধতি): প্রথম বর্ণের পুরুষের সঙ্গে যদি তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের কন্যার (যেমন – ব্রাহ্মণ + বৈশ্য, ব্রাহ্মণ + শূদ্র), দ্বিতীয় বর্ণের পুরুষের সঙ্গে চতুর্থ বর্ণের কন্যার (যেমন– ক্ষত্রিয়া + শূদ্র) বিবাহ হয়, তবে উৎপন্ন সন্তান ভিন্ন জাতিভুক্ত হবে।

ঘ. অসবর্ণ বিবাহ (প্রতিলোম পদ্ধতি): নিম্নতর বর্ণের পুরুষের সঙ্গে যদি উচ্চতর বর্ণের কন্যার বিবাহ হয়, তবে উৎপন্ন সন্তান ভিন্ন জাতির অন্তর্গত হয়।

ঙ. অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা উৎপন্ন সঙ্কর জাতিগুলোর সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের বিবাহ ও সঙ্কর জাতিগুলোর মধ্যে বিবাহের ফলে সঙ্কর জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

চ. যারা ব্রাত্য অর্থাৎ বৈদিক সংস্কারাদিতে ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করার জন্য আর্য-সংস্কৃতি বহির্ভূত বা পতিত বলে গণ্য, তারাও সঙ্কর জাতির অন্তর্গত (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৫: ১১৮-১১৯)।

বর্ণসঙ্করদের (শর্মা, ১৯৯৯: ৩০৬-৩১২) সর্বদাই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হিসেবে ভারতীয় সমাজকাঠামোর তলদেশে স্থান দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে *রামায়ণে* বলা হয়েছে 'রাজত্বে প্রজারা সুখী, বর্ণসঙ্কর নেই' (সিংহ, ২০১০: ৯১)। *মহাভারতের* প্রারম্ভে বর্ণিত 'বেন' রাজার পুত্র পৃথুর প্রতিজ্ঞা ছিল 'বর্ণসঙ্কর থেকে দেশকে রক্ষা' (সিংহ, ২০১০: ৯১)। *গীতায়* অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিতে আপত্তি জানান, যার কারণ ছিল 'মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় পুরুষদের বিনাশ হলে ক্ষত্রিয় কুলনারীগণ অন্য বর্ণের পুরুষদের সাথে মিলিত হয়ে বর্ণসঙ্কর জন্ম দেবে' (সিংহ, ২০১০: ৯২)। এসব দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতীয়মান হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বর্ণসঙ্করতা অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঘৃণ্য হলেও একে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর প্রতি পুরোহিতকুলের বৈরী ও প্রতিকূল মনোভাবের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন–

> ঐতিহাসিকভাবে চারশ বছরের বেশি কাল-সীমার মধ্যে পাঁচ ছ'টি বিদেশী আক্রমণ ঘটে এবং অনিবার্যভাবে বর্ণসংকরেরও বিস্তার ঘটে, যার দ্বারা ধীরে ধীরে বৈদেশিকরা সমাজ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রথমে শূদ্র রূপে ও পরে ক্ষত্রিয় রূপে। দ্বিতীয়ত, বর্ণসংকর ঘটলে ঐ চতুর্বর্ণের পরিচ্ছন্ন একটা ছক, শাস্ত্রে যা চলে আসছিল, সেটা এলোমেলো হয়ে যায়, সমাজপতিদের মিশ্রবর্ণ সম্বন্ধে নতুন আইন তৈরি করতে হয়, ক্রমে ক্রমে তা করতে বাধ্যও হয়েছিলেন তাঁরা। তৃতীয়ত, বৃত্তিভেদ অনুসারে বর্ণ ক্রমেই বহু জাতিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং যাচ্ছিল। তার ওপরে বিদেশী জাতির সঙ্গে মিলনে আরও বহুধা-বিভক্ত সমাজের ছক নির্মাণ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। চতুর্থত, বিদেশীদের প্রথমে শূদ্র বললেও যেহেতু তাঁরা বিজেতা এবং শক্তিমান, তাই ধীরে ধীরে তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হলেন। এই যে উচ্চতর বর্ণে অধিরোহণ, এটা শাস্ত্রকারদের কাছে অগ্রাহ্য মনে হয়েছিল (সিংহ, ২০১০: ৯২)।

মনুর পূর্বে কৌটিল্য চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে রচিত *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণসঙ্করতা প্রসঙ্গে যে বিধান দিয়েছেন, সেখানে প্রতিলোম বিবাহপদ্ধতিতে শূদ্র পুরুষ ও নারীর সঙ্গে উচ্চতর তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃত ছিল (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৫: ৮২)। কিন্তু পরবর্তীকালে মনু স্মৃতিশাস্ত্রে এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেন। সেখানে বর্ণসঙ্করের মাধ্যমে উৎপাদিত অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহরীতি অনুযায়ী জন্মগ্রহণকৃত জাতকমাত্রই শূদ্র হিসেবে বিবেচিত, কোনোভাবেই তারা দ্বিজ অর্থাৎ প্রথম

তিন বর্ণভুক্ত হবে না। তিনি ব্রাত্যদেরও সঙ্কর জাতিভুক্ত করেছেন, যারা বৈদিক সংস্কারাদি ও আচার-যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৫: ১১৮-১১৯)। বর্ণসঙ্করতার প্রতি মনুর কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে যতই আর্যামির গর্ব থাকুক না কেন, ধর্মীয় বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বহিরাগত ভিন্নভাষী মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মিলন সমাজে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। বিশেষত বৌদ্ধ যুগে বর্ণগত ভেদাভেদ ক্ষীয়মান হয়। কারণ তখন সব বর্ণের মধ্যেই ব্যাপকভাবে বর্ণমিশ্রণ ঘটছিল। অবশেষে বৌদ্ধযুগের অবসানের পর ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয় শক্তি পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করায় তথাকথিত শূদ্র অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তিতে বিভক্ত জাতিসমূহের মেলামেশা ও পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে কঠোর বিধান প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* গ্রন্থদ্বয়ে (রায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ২১১) বর্ণসঙ্করতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয় । *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বলা হয়েছে–

> অরাজক দেশে পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত বলপূর্বক সংসর্গ করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ায় উপগত হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত হয়, এই রূপে কুলে সঙ্কর দোষ হয়। ... এইরূপ অন্য জাতীয় পুরুষের সহিত অন্য জাতির স্ত্রীকে সঙ্গত করিয়া ... সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইল (ইসলাম, ২০০১: ৫৯-৬০)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চার বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> পরে সেই চারি জাতিরই সাঙ্কর্য্যকশতঃ অর্থাৎ দুই প্রকার জাতির স্ত্রী-পুরুষ হইতে যাহাদিগের জন্ম হয় তাহারা বর্ণ সঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ (ইসলাম, ২০০১: ৬০)।

'জাতি' শব্দটির দ্যোতনাগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ যথেষ্ট কঠিন। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বর্ণ থেকেই জাতির উদ্ভব ঘটেছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ সামাজিক কাঠামো ও ধর্মীয় আবহে 'জাতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Nation' যথার্থ ব্যঞ্জনা বহনে অক্ষম। অথচ 'Caste' শব্দটি যুগপৎ বর্ণ ও জাতি উভয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত, যদিও বর্ণ ও জাতি কখনোই সমার্থবাচকতাসম্পন্ন সামাজিক একক নয়। বর্ণপ্রথার বিস্তারের একটি পর্যায়ে প্রতিলোম বিবাহের পরিণতিতে নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর যৌনমিলনে উদ্ভূত জাতককে শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত করার মাধ্যমে অজস্র জাতির সৃষ্টি হয়। যেমন– শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গমে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, সে 'চণ্ডাল' জাতির অন্তর্গত হবে, এমনটিই মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারের বিধান। অর্থাৎ জাতির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই যুক্ত হয় বিশেষ বৃত্তি বা পেশা এবং পরবর্তীকালে পেশাকে কেন্দ্র করেই জাতির নাম নির্ধারিত হয়–

বাংলার জাতিব্যবস্থায় যে জাতিগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি আসলে এক একটি বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, বংশ পরম্পরায় যারা একই কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ এই জাতিব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবেই একটি সুসংগত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে উঠেছিল, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতব্যবস্থার সঙ্গে বর্ণছকের যোগাযোগ ছিল গভীর। নির্দিষ্ট পেশায় বিভিন্ন দলগুলিকে এক একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হলেও একই সময়ে কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং সেবক জাতিগুলি বর্ণ হিসেবে শূদ্র বলেই পরিচিত হত (ভট্টাচার্য, ২০১০: ২৮)।

পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী কেটকার জাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে জাতি হলো–

a social group having two characteristics - (1) membership is confined to those who are born of members and includes all persons so born; and (2) the members are forbidden by any inexorable social law to marry outside the group. (রায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ১৩১)।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সমাজ-নৃতত্ত্ববিদ এডমন্ড লীচ 'জাতি'র নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রদানের পরিবর্তে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য সনাক্তিকরণের মাধ্যমে জাতি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেগুলো হলো – ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ, বংশ-পরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন, সমকুলে বিবাহ, ভোজন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনুকরণ এবং অস্পৃশ্যতা (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ৭)। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্যমান গুণাবলির মানদণ্ডে জাতিসমূহের একটি স্বতন্ত্র ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অভিমত–

একটি তার আত্ম-সংজ্ঞা, যা একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য, যা জাতির নিজস্ব সত্তাকে নির্দিষ্ট করে। আর অন্যটি হল অপরের-জন্য-সংজ্ঞা, যার ভিত্তিতে কোনো জাতি অপরাপর জাতিগুলির থেকে নিজেকে আলাদা করে। কোনো জাতিকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা যে কোনো মানই ব্যবহার করি না কেন, তা ইতিবাচক ও নেতিবাচক–এই দুই ধরনের সংজ্ঞারই ইঙ্গিত দেবে। অর্থাৎ চামারকে যদি নির্দিষ্ট করা হয় এমন একটি জাতি হিসেবে, যারা মৃত পশুর সৎকার করে, তবে এই আত্মসংজ্ঞা তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত দেবে একটি অপরের-জন্য-সংজ্ঞার, যা হল, অন্য জাতিগুলি (অন্তত কিছু জাতি) এই কাজ করে না। এইভাবে জাতিগুলির মধ্যে গুণানুযায়ী বিভাগ ও শ্রেণীবিভেদ করা সম্ভব (চট্টোপাধ্যায়, ২০০০: ৭২)।

তবে মনে রাখা জরুরি যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জাতি প্রথার অজস্র ভেদাভেদ রয়েছে; এছাড়াও জাতিসমূহের অভ্যন্তরে রয়েছে অগণিত খণ্ড জাতি, সর্বোপরি অস্পৃশ্য জাতিসমূহ, যাদের অবস্থান বর্ণপ্রথার কাঠামোর বাইরে। সেকারণে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের সবকটিই যে সব জাতির বা খণ্ড জাতির ক্ষেত্রে আরোপ করা সম্ভব হবে, এমন সিদ্ধান্তে

আসা অযৌক্তিক। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-নৃতত্ত্ববিদদের মতে, জাতিভেদ ব্যবস্থা উদ্ভবের পশ্চাতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল বর্ণ, অর্থাৎ নৃগোষ্ঠীগত বিভেদ এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তিচেতনা। ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিসমূহের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে নিহিত সামাজিক আবহের স্বরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যালের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি জানিয়েছেন–

এটা জানা যায় না যে বর্ণ ব্যবস্থার পূর্বকল্পিত প্রসারের ফলেই জাতি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল কিনা, নাকি জাতি ব্যবস্থা ভারতের প্রাক-আর্য চ্যালকোলিথিক সভ্যতায় বিদ্যমান শ্রমের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ স্বাভাবিক বিভাজনেরই একটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ, যা কিনা আর্য সংস্কৃতি প্রভাবিত বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পরে সমন্বিত হয়েছিল। যাই হোক, হিন্দু সমাজের চরিত্র ও গঠন বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, জাতি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে প্রধানত পর্বত ও অরণ্যবাসী দেশীয় উপজাতিসমূহের এবং চ্যালকোলিথিক বাসিন্দাদের সম্প্রসারণশীল হিন্দু সমাজে আত্মভূতকরণের মাধ্যমে। রক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্র অথবা পুরাণ অনুযায়ী জাতিগুলির উদ্ভব হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে। প্রসরণশীল আর্য ও দেশীয় অনার্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে আন্তঃবর্ণ বিবাহের বহু উল্লেখ রয়েছে। এটা সম্ভব যে বর্ণবিভাগ যেহেতু দৃঢ় এবং বংশগত হয়ে উঠল, সেহেতু আন্তঃবর্ণ বিবাহজাত সন্তানেরা শেষে একটি ভিন্ন শ্রেণীতে পর্যবসিত হল (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ২২)।

ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রসারই পর্বত ও অরণ্যবাসী উপজাতিদের নিয়ে গঠিত দেশীয় অনার্যদের ও চ্যালকোলিথিক জনবসতিগুলোকে হিন্দুসমাজের বিরোধী অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল। তবে আর্যদের কাছে এসব জনগোষ্ঠীর পরাজয়ের পরিণতিতে এরাও হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হয়। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত সংযোগসাধনের পরিণতিতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন ও বণ্টনের কাঠামোতেই নতুনত্ব সংযোজিত হয়। এসব অনার্য কৌমগোষ্ঠী ও উপজাতি বর্ণ হিন্দুসমাজের প্রান্তদেশে স্থান পেয়েছিল। এর ফলে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ধাতু আহরণ ও শিকারী জীবনের পরিবর্তে তারা স্থায়ীভাবে কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহকেও বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করত। ধারণা করা হত, দলটি বংশগতভাবেই সে পেশাকে অবলম্বন করবে–

বর্ণভিত্তিক সাধারণ শ্রমবিভাজন সম্প্রসারিত হল জাতিব্যবস্থার মধ্যে পেশাগত বিভেদীকরণের বিশদ ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন দলের পারস্পরিক সম্পর্কে। আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যশ্রেণী ধীরে ধীরে কায়িক শ্রমসাপেক্ষ পেশা ত্যাগ করে ব্যবসা ও তেজারতির মতো কাজকর্মে পূর্ণ মনোযোগ দিল। শূদ্রদের মূল পেশার সঙ্গে কৃষিকার্য,

পশুপালন এবং কারিগরি শিল্পের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। অন্য যে কোনো পেশার থেকে কৃষিকার্যই অধিক সংখ্যক লোকের উপযোগী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা হিন্দুসমাজের ভেতরে ঠাঁই পেল তাদের বেশির ভাগেরই চাষাবাদ সম্পর্কে খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। যথার্থই কৃষিকার্য নানা জাতির সাধারণ পেশা হয়ে দাঁড়াল। ... বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিল্প, নানা সামগ্রীর ব্যবসা এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজকর্ম– সবই বিশিষ্ট এবং বিশেষ দক্ষতার পেশা হিসাবে পরিগণিত হত, যেগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। এইভাবেই কারিগরদের মধ্যে রয়েছে তন্তুবায় বা তাঁতি, কর্মকার বা কামার, মোদক বা ময়রা, সূত্রধর বা ছুতার, চর্মকার বা চামার বা মুচি, শাঁখারি, তেলি, কাঁসারি, শুঁড়ি এবং ডোম (যারা ঝুড়ি তৈরি করত)। ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছে গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক এবং সুবর্ণবণিক আর সেবক জাতিদের মধ্যে নাপিত, ধোপা এবং হাড়ি। নির্দিষ্ট পেশার বিভিন্ন দলগুলিকে বিশিষ্ট জাতি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু একই সময়ে কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং সেবক জাতিগুলি বর্ণ হিসাবে শূদ্র বলে পরিচিত। বিশেষজ্ঞ পেশাদার দলগুলি প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতিগুলির সংখ্যা বর্ণের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি। বেশির ভাগ ব্যক্তিই জাতিগুলির পেশাদার গোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত, যাদের মধ্যে সমাজের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বর্ণাপেক্ষা জাতির পরিভাষায় হিন্দুসমাজের কাঠামোটিকে বেশি ভালো করে বুঝতে পারা যায়। এই অবস্থায় বর্ণ দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, বাংলার মতো অঞ্চলে যেখানে দেশীয় মানুষদের মধ্যে কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নেই, সেখানে ব্রাহ্মণরাও একটি জাতি হিসেবে পরিচিত যদিও তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ বর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ২৪-২৫)।

*মনুস্মৃতি*র দশম অধ্যায়ে (যেটি গুপ্ত যুগের শেষ দিকে সংকলিত বলে অনুমান করা হয়) (শর্মা, ১৯৯৯: ৩০৩) একষট্টিটি মিশ্র জাতির এক বিচিত্র সারণি নির্দেশিত হয়েছে। রামশরণ শর্মা এর কারণ হিসেবে বর্ণ-সঙ্করতার পাশাপাশি অন্য কিছু বিষয়কেও নির্দেশ করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্রাত্য তত্ত্ব। অর্থাৎ যারা দ্বিজ বর্ণের হয়েও বিভিন্ন কারণে যজ্ঞ, উপনয়ন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি, তাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিধান। তাই তাদের শূদ্র বর্ণে বিচ্যুত করা হয়। এভাবে মিশ্র জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ও পতনের পর অষ্টম খ্রিস্টাব্দ থেকে পাল রাজাদের অব্যবহিত পূর্বকালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা ভূভাগে আগত ব্রাহ্মণরা বসতি স্থাপন শুরু করে। এ রীতি প্রবলতর হয় সেন রাজত্বে। বল্লাল সেনের সমসাময়িককালে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহের তালিকা প্রবর্তনের অন্তরালে ইতিহাসবিদ লক্ষ করেছেন 'বাঙালী হিন্দু সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সমাজকে ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার' (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৭: ১৩৩)

সবিশেষ প্রচেষ্টা ও অভিপ্রায়। নীহাররঞ্জন রায় (১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ২৪৬-২৪৯) দেখিয়েছেন, *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* ব্রাহ্মণ ব্যতীত অবশিষ্ট বর্ণসমূহের অন্তর্গত সকল জাতিকেই সঙ্কর বা মিশ্র জাতি হিসেবে শূদ্র বর্ণভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ প্রদত্ত ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার যোগ-সাযুজ্য খুঁজে পাননি। এছাড়াও এ গ্রন্থে তিন ভাগে উত্তম, মধ্যম ও অধম সঙ্কর হিসেবে ৩৬টি জাতি বা উপবর্ণের উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তালিকায় স্থান পেয়েছে ৪১টি জাতি।

উত্তম সঙ্কর: ১. করণ ২. অম্বষ্ঠ ৩. উগ্র. ৪. মাগধ ৫. তন্তবায় ৬. গন্ধবণিক ৭. নাপিত ৮. গোপ ৯. কর্মকার ১০. তৈলিক বা তৌলিক ১১. কুম্ভকার ১২. কাংসকার ১৩. শাঙ্খিক বা শঙ্খকার ১৪. দাস ১৫. বারজীবী ১৬. মোদক ১৭. মালাকার ১৮. সূত ১৯. রাজপুত্র ২০. তাম্বলী;

মধ্যম সঙ্কর: ২১. তক্ষণ ২২. রজক ২৩. স্বর্ণকার ২৪. সুবর্ণ বণিক ২৫. আভীর ২৬. তৈলকার ২৭. ধীবর ২৮. শৌণ্ডিক ২৯. নট ৩০. শাবাক, শাবক, শারক, শাব ৩১. শেখর ৩২. জালিক;

অধম সঙ্কর: ৩৩. মালগ্রহী ৩৪. কুড়ব ৩৫. চণ্ডাল ৩৬. বরুড় ৩৭. তক্ষ ৩৮. চর্মকার ৩৯. ঘট্টজীবী ৪০. ডোলাবাহী ৪১. মল (এরা অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত এবং বর্ণকাঠামোর বাইরে এদের অবস্থান।)।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে উপর্যুক্ত জাতিসমূহ ব্যতীত আরো কিছু আদিবাসী কৌমের নাম জানা যায়, যারা বর্ণপ্রথার অন্তর্গত নয়; অর্থাৎ অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় বা ম্লেচ্ছ। যথা– পুকক্শ, পুলিন্দ, খস, থর, কাম্বাজ, যবন, সুহ্ম, শবর প্রভৃতি। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে*ও যথারীতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণভুক্ত জাতিকে সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ তালিকা যে অসম্পূর্ণ, তা উক্ত গ্রন্থেই নির্দেশিত। এ গ্রন্থে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের উৎপত্তির পৃথক কাহিনী প্রদানপূর্বক তাদেরকে পৃথক জাতি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

সৎশূদ্র: ১. করণ ২. অম্বজ ৩. বৈদ্য ৪. গোপ ৫. নাপিত ৬. ভল ৭. মোদক ৮. কুবর ৯.তাম্বুলী ১০. স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক ১১. মালাকার ১২. কর্মকার ১৩. শঙ্খকার ১৪. কুবিন্দক ১৫. কুম্ভকার ১৬. কাংসকার ১৭. সূত্রধার ১৮. চিত্রকার ১৯. স্বর্ণকার (সূত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রধার – এ তিন জাতি কর্তব্য অবহেলার দায়ে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' অর্থাৎ অসৎ শূদ্রের অন্তর্গত হয়।)।

অসৎশূদ্র: ২০. অট্টালিকাকার ২১. কোটক ২২. তীবর ২৩. তৈলকার ২৪. লেট ২৫. মল ২৬. চর্মকার ২৭. শুঁড়ি ২৮. পৌণ্ড্রক ২৯. মাংসচ্ছেদ ৩০. রাজপুত্র ৩১. কৈবর্ত ৩২. রজক ৩৩. কৌয়ালী ৩৪. গঙ্গাপুত্র ৩৫. যুঙ্গি ৩৬. আগরী।

অসৎশূদ্রের চেয়েও নিম্নপর্যায়ের অর্থাৎ অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হিসেবে এ পুরাণ যেসব জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তারা হলো ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল, কোঞ্চ, হডডি, ডোম, জোলা, বাগতীত, শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল প্রভৃতি। বস্তুত বেদোত্তরকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র– এ চার জাতির মধ্যে পার্থক্য যখন ঘনীভূত হয়েছিল, তখন থেকেই জাতি সম্পর্কে তাদের মনে প্রবল গোঁড়ামির সঞ্চার ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চিন্তায় তখন রক্তের বিশুদ্ধতা, আচার-ব্যবহারের শুচিতা প্রাধান্য পায়, এমনকি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উত্তর ভারতে প্রচলিত একটি প্রবাদ হলো 'তিন কনৌজিয়া তেরহ চুলি।' – অর্থাৎ তিন কনৌজ ব্রাহ্মণ যদি একত্র হয়, তবে তাদের শুচিতা বজায় রাখতে তেরটা রন্ধনশালার প্রয়োজন (সুর, ১৯৮৮: ১৭৫-১৭৭)। বিভিন্ন বহিরাগত জাতির এদেশে আবির্ভাবের মাধ্যমে জনপ্রবাহে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটছিল, বিশেষত বৌদ্ধ যুগের পর মুসলিম আমলের অব্যবহিত পূর্বকালে সেনযুগে নবোদ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে জাতিভেদের কঠোরতা আরোপিত হয়। এ কাজকে সহজতর করতে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্যতীত সকলকেই জোরপূর্বক সঙ্কর জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। তুর্কি শাসনামলে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন বহুলাংশেই এ ধর্ম গ্রহণ করছিল, তখন হিন্দু সমাজের এ পতন রোধ করতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার রঘুনন্দনের বিধান ছিল 'মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ ধর্মান্তরিত লোকরা আবার হিন্দু হতে পারবে' (সুর, ১৯৮৮: ১৭৮)। অতুল সুর *বোধায়ন ধর্মসূত্র*, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, *গৌতম ধর্মসূত্র*, *মনুসংহিতা*, *মহাভারত*, *পরাশর সংহিতা*, *সূতসংহিতা*, *উশানস্‌সংহিতা*, *বিষ্ণু ধর্মসূত্র*, *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র*, *যাজ্ঞবল্ক্য*, *জাতিমালা* ও কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের* আলোকে সঙ্কর জাতির উদ্ভব নির্দেশ করতে গিয়ে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন (সুর, ১৯৮৮: ১৭৯-১৮১)। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার ও বিধায়কদের মধ্যে কোনো মতৈক্য ছিল না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোধগম্য হয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজকাঠামো স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একদিকে সমাজের উৎপাদনকাঠামোকে সচল রাখতে যেমন বিভিন্ন কৌমকে বর্ণসঙ্করতার তত্ত্ব অবলম্বনপূর্বক স্থায়ী বৃত্তিতে নিয়োজিত রেখেছিল, অন্যদিকে এদের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই ধর্মীয়-সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পারস্পরিক মেলামেশা, ওঠাবসা, আহার-বিহার থেকে দূরত্ব মেনে চলছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন–

> The authors of Dharmasutras & Smritis regarded the vedas as eternal and infallible, and therefore strove hard to bring the actual state of society within the framework of the four vernas. Hence they started with the theory that the numerous castes (and even tribes and races), actually existing in the country, arose from the union of males with females belonging to vernas differing from their own. This theory, originally applied to the males & females of the four primitive varnas, had to be extended to those of the subsidiary or mixed castes, arising out of their union; for, otherwise it was not possible to account for the numerous castes & subcastes which continually went on increasing (ভট্টাচার্য, ২০১০: ৩০-৩১)।

সন্দেহ নেই যে সভ্যতার অগ্রগতির পাশাপাশি নতুন কারুশিল্পের বিকাশে, ভিন্ন পেশা ও বৃত্তি অবলম্বনের ফলে সামাজিক প্রতাপের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রস্থ উচ্চবর্গের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জোট উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। নতুন কারিগর জাতিগুলোর কেউ কেউ কর্মদক্ষতা গুণে আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, যা বেদ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। এর প্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়, পাল আমলেই সুবর্ণবণিক, সূত্রধর প্রভৃতি জাতি যথেষ্ট সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

> ব্রাহ্মণদের এবার উপলব্ধি হচ্ছিল, অন্তত সকলকে একসঙ্গে চটানো যাবে না, সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখতে হলে একদলকে কিছুটা ক্ষমতার ভাগ দিতেই হবে। কায়স্থ-করণ-বৈদ্য-অম্বষ্ঠরা তাই শূদ্র হয়েও জাতিকাঠামোর উপরিস্তরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্মরণ করতে পারি, অন্তত সপ্তম শতক পর্যন্ত বঙ্গের রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল না, বরং কায়স্থদেরই প্রাধান্য ছিল। শিল্পী-ব্যবসায়ীরা আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। সুতরাং এদেরকে বর্ণব্যবস্থার নিচের স্তরে *ঠেলে* দেওয়া হলো। গোটা বিষয়টির মধ্যে যে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসই মূল তাগিদ, তা স্পষ্ট হয়, যখন উপপুরাণগুলির জাতিতালিকা লক্ষ করা যায় (ভট্টাচার্য, ২০১০: ৩১)।

ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব মানুষের স্পর্শ, সান্নিধ্য এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দর্শন পর্যন্ত অশুচি, ক্লেদাক্ত বিবেচিত হয়। এমনকি সামাজিক জীবনে তাদের উপস্থিতিও বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে বারবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা তাদের স্পর্শ বা দর্শনে বস্তু হারায় শুদ্ধতা, ব্রাহ্মণ তার পবিত্রতা থেকে স্খলিত হয় বলে কথিত (ভদ্র ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪: ৬৯-৭০)। যেহেতু শূদ্র তমঃ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুণের অধিকারী এবং বর্ণগত দিক থেকে তার অবস্থান সর্বনিম্নে, সেকারণেই তার ওপর প্রযুক্ত হয় সকল পঙ্কিলতা, ত্রুটি, পাপ, কলুষতা এবং স্বাভাবিকভাবেই অশুচি কর্মের ভার। তদুপরি অন্ত্যজ শ্রেণির অবস্থান যেহেতু বর্ণপ্রথা কাঠামোর বাইরে এবং শূদ্রের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ে, তাই তাদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্র মানুষ হিসেবে মর্যাদা দানে অস্বীকৃত। তবে অস্পৃশ্যতা ও অশুচিতার ধারণা আর্যদের

সৃষ্ট নয় (জলদাস, ২০০৮: ৮), বরং অনার্যদের মধ্যেই এ প্রবণতার সূত্রপাত বলে নীহাররঞ্জন রায় অভিমত জানিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র রায়ের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন–

> উচ্চ-নীচ ভেদ প্রবণতা দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতাবোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল সম্ভবত দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর মধ্যে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতাবোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্যনর্ডিক নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল আর্যেরা শুচিপ্রবণতার জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়পূর্ব নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শ বর্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রাবিড়দের বাহ্য শুচিবোধ আরও উত্তেজিত হইল (রায়, ১৪০৭: ৫৫)।

তবে এ মতের সঙ্গে রামশরণ শর্মা সম্পূর্ণ একমত নন। তিনি মনে করেন, অস্পৃশ্যতার ধারণার সূত্রপাত ঘটে প্রাগ-মৌর্য যুগে, যখন একইসঙ্গে বৌদ্ধধর্মেরও উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। এ ধারণা প্রকট হতে থাকে উক্ত যুগের অন্তিম পর্যায়ে (শর্মা, ১৯৯৭: ১২৯)। আর্য জাতির ভারতে আগমনের প্রথমদিকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ অপরিণত ছিল বলেই কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে ঘৃণা বা অবজ্ঞাসূচক মনোভঙ্গি জড়িত ছিল না। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষদিকে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষি অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয় এবং ক্রমশ তা আরো সম্প্রসারিত হয়। সেই পর্যায়ে জমি ও পশুর স্বত্বাধিকারী মালিকশ্রেণির উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে ধন সঞ্চয়ের পরিণতিতে কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা ও বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০: ৯)। তখন ব্রাহ্মণরা যজন-যাজন, ধর্ম-কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়রা রাজশাসন-যুদ্ধ পরিচালনাকেই অবলম্বন করে। অন্যদিকে বৈশ্যরাও কৃষি, কারিগরী শিল্প ও পশুপালন থেকে সরে এসে ব্যবসাবৃত্তিতে স্থিত হয়। সুতরাং, বাধ্য হয়েই কায়িক শ্রমপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয় শূদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণির ওপর। এভাবেই তারা পেশা ও সামাজিক অবস্থানের কারণে উচ্চবর্গের দ্বারা অস্পৃশ্য, অশুচি প্রভৃতি নেতিবাচক মানসিকতায় যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত, শোষিত হয়ে চলেছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ২৬-২৭)। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন, অনার্যদের প্রতি আর্যদের অপবিত্রতা, অশুচিতার ধারণা পোষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে উভয়ের সাংস্কৃতিক ব্যবধান–

> আদিম জনগোষ্ঠীর লোক ছিলেন মূলত নিষাদ ও ব্যাধ। বিপরীতপক্ষে, ব্রাহ্মণ্য সমাজের লোক বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন এক নাগরিক জীবনের। তাঁরা ধাতুর কাজ ও কৃষিবিদ্যা

> জানতেন। এই সাংস্কৃতিক ব্যবধানই হলো অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অনুন্নত বস্তুগত সংস্কৃতি এবং তার ফলে তাঁদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা আছে বৌদ্ধ রচনায় ... চণ্ডাল, নিষাদ, বেণ, রথকার ও পুক্কুস ... এইসব ঘৃণ্য জাতির জীবিকা ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং শূদ্রদের চেয়ে তাদের অবস্থা ছিল আরও অনেকখানি খারাপ। ... বাস্তব জীবনে এই বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যেই যে ঘৃণাব্যঞ্জক মানসিকতা বেড়ে উঠছিল তা আরও তীব্র হয়। ... বেদোত্তর সমাজেও তেমনি দেখা দিতে শুরু করে কায়িক শ্রম ও বৃত্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব। কালক্রমে উচ্চবর্গের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা প্রাথমিক উৎপাদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন, তাঁদের পদ এবং কাজ হয়ে উঠল বংশানুক্রমিক। আর তখনই তাঁদের মধ্যে জেগে উঠল কায়িক শ্রমের প্রতি ঘৃণা–শুধু তা-ই নয়, যে হাত সেই কাজ করে ঘৃণা প্রসারিত হলো তার দিকেও। ... আদিবাসীদের অতি নিম্নস্তরের বস্তুগত সংস্কৃতির এই পটভূমিকায়, কায়িক শ্রমের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হলো বস্তুবিশেষের সঙ্গে সংশিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ('ট্যাবু') এবং অশুচিতার আদিম ধারণা। আর এ দু-এ মিলেই সৃষ্টি হলো অস্পৃশ্যতা নামক এক অনন্য সামাজিক ঘটনা (শর্মা, ১৯৯৭: ১৩৪-১৩৫)।

অন্ত্যজদের সনাক্ত করতে গিয়ে *ভাগবত পুরাণে* বলা হয়েছে– 'অন্ত্যাবসায়ীদের বৈশিষ্ট্য হলো অশুদ্ধি, অসত্য, চৌর্য, ব্রহ্মদূষণ (ব্রাহ্মণ্যনিন্দা), অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ' (শর্মা, ১৯৯৭: ২৬৫)। সামাজিক উপযোগিতার কারণেই আধিপত্যবাদী বর্গ তাদের ব্যবহার করেছে সমাজের বর্জ্য ও পরিত্যক্ত পদার্থের নিষ্কাশন, মৃতদেহের সৎকার, বধ্য ব্যক্তিকে বধ এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি অশুচি, নোংরা কাজ সম্পাদনের জন্য; অথচ তাদেরই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রসমূহে অবহিত করা হতো 'যাবতীয় ঘৃণার্হ জাতিরও ঘৃণণীয়' হিসেবে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০: ১২)। তাদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে। জন্মগতভাবে বর্ণসঙ্কর হওয়ায় এদের উদ্দেশ্য করে মনুর বিধানে বারবার নির্দেশিত হয় তাদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও লেনদেন, কোনো বস্তু-সামগ্রীর আদান-প্রদানের ব্যাপারে (বিশ্বাস, ২০০৭: ১৪৮)। প্রান্তজনের শ্রমকে কুক্ষিগত করেই উচ্চবর্গের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার আস্ফালন বিস্তৃত হলেও তাদের শ্রমকে অশুচি বিবেচনাপূর্বক অস্পৃশ্যতার প্রাচীর নির্মাণের সযত্ন প্রচেষ্টা বহুকাল ধরেই ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রচলিত। ক্রমোচ্চ বিন্যাসের কঠোর ছকে বংশ-পরম্পরায় তাদের অবস্থান করতে হয় সমাজের তলদেশে, অথচ প্রান্তবাসীর পক্ষ থেকে কোনোভাবেই এই শোষণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা যায় না; অস্বীকার করা চলে না ব্রাহ্মণ্যবাদী আদেশের জগদ্দল পাথরকে। (ভদ্র ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪: ৭৩) ভারতবর্ষীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সঙ্গে শূদ্র-অন্ত্যজ গোষ্ঠীর পারস্পরিক অবস্থান বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক, সর্বদাই

কেন্দ্র-প্রান্তের অসীম দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিষ্ঠিত। বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদের মাধ্যমে এই অসীম বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে (বন্দোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১০০৮: ২৯, ৫৩)।

ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস গুপ্ত যুগের পর পাল, চন্দ্র ও কম্বোজ যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল শাসকগণ বৌদ্ধ হলেও তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন (রায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ২৩১)। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণকাঠামো জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকেও যে প্রভাবিত করেছিল, সে প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যাপ্তই রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা বর্ণব্যবস্থার প্রসার বাড়িয়াই চলিয়াছিল, ... জৈন ধর্ম ও সংস্কার তো ধীরে ধীরে বিলীন হইয়াই যাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শকে যে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছিল, পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে' (রায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ২৩৫)। তবে সেন ও বর্মণ শাসকদের দেড়শ বছরের রাজত্বকালে বর্ণভেদ প্রথা বাংলা ভূভাগে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজবংশ কর্ণাটকাগত। তারা পূর্বে ব্রাহ্মণ হলেও পরবর্তীকালে যোদ্ধৃবৃত্তি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় হন এবং 'ব্রহ্মক্ষত্র' রূপে পরিচিত হন। বর্মণ বংশ কলিঙ্গাগত বলে অনুমিত এবং বর্ণগত বিবেচনায় ক্ষত্রিয়। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদিও আচার-অনুষ্ঠান, সাধন পদ্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কার, রীতি-নীতিকেও প্রভাবিত করেছিল (রায়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ২৩৭)। সে কারণেই সেন যুগে বর্ণপ্রথার সুকঠোর শৃঙ্খলে সমগ্র বাংলা ভূ-ভাগকেই আবদ্ধ হতে হয়, বিশেষত সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, বিভিন্ন কুলজী ও স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে বর্ণপ্রথাকে সে যুগে সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি গ্রন্থের ভিত্তিতে শূদ্র শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি। শূদ্র বর্ণ সম্পর্কে *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বলা হয়েছে–

> শূদ্রগণ বিপ্রসেবায় আলস্য করিবে না এবং কদাচ ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা বা অবজ্ঞা করা কিংবা ব্রাহ্মণগণের আচরণীয় বৈদিক বা লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, পুরাণ পাঠ, বেদ পাঠ ও শাস্ত্রার্থের কথন শূদ্রের কদাচ কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বর্ণমালা ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, শোক বা শোকার্থ অধ্যয়ন করানো শূদ্রের অকর্তব্য। (ইসলাম, ২০০১: ৫৯)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বর্ণপ্রথার অন্তর্গত সকলকেই শূদ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অসৎ শূদ্ররা অন্ত্যজ হিসেবে পরিচিত।

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ঘটনায় সেন রাজবংশের পতন, অতঃপর সুদীর্ঘ সময় মুসলিম ও ইংরেজ শাসনের অবসানের পর স্বাধীন ভারতেও যে বর্ণপ্রথার ভয়াবহ রূপ বিদ্যমান, তা প্রতীয়মান হয় সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রে বেতেই-এর গবেষণাকর্মে (বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ৫৫-৫৬)। তিনি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু সমাজের রূপরেখা নির্দেশ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, উক্ত অঞ্চলের সমাজ কাঠামোতে হরিজন শ্রেণি সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থানরত; বিশেষ করে কেরালা ও তামিলনাড়ুতে। এসব স্থানে হরিজনদের স্পর্শেই সবকিছু দূষিত হয়, এরূপ ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত। শুধু তাই নয়, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তাদের দর্শনই যথেষ্ট। মালাবার অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির শ্রেণিভেদ ব্রাহ্মণদের থেকে কে কতটা শারীরিক দূরত্ব মেনে চলতে বাধ্য, তার ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার পর এসব রীতি ভারতে সরকারিভাবে বন্ধ করা হলেও তিনি ১৯৬১-৬২ সালে গবেষণাকালে গ্রামবাসীর আচরিত দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনের চেয়ে গ্রামবাসীর সামষ্টিক অবচেতনলোকে এখনো হাজার বছরের প্রবহমান সংস্কার ও সামাজিক রীতির প্রতি সমীহবোধই অধিক গুরুত্ববহ।বর্ণপ্রথার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী অনার্যদের পরাভূত করে সামাজিক আধিপত্যকে আয়ত্তীভূত করার যে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করেছিল, এর সুদূরপ্রসারী অভিঘাত উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজকে বারবার প্রভাবিত করেছে। এর পরিণতিতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ ক্রমশই ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছে। তবে উক্ত গোষ্ঠীর অনুশাসন-শৃঙ্খল অতিক্রমের ক্ষেত্রে যুগান্তর ভূমিকা পালন করেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত বিবিধ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড। শিক্ষা বিস্তার, যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার, কারখানা স্থাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারণ, পুঁজিবাদের ক্রম-সম্প্রসারণ ও মুনাফাবৃত্তির দাপটে পরিবর্তিত সমাজকাঠামোতে অর্থই হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রকশক্তি। এর পরিণতিতে বর্ণব্যবস্থার ভঙ্গুরতা সময়ের পরিবর্তনে ত্বরান্বিত হলেও একালের গ্রামীণ জনসমাজে এর রেশ এখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অজয় রায় (১৯৮৭)। "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

অতুল সুর, (১৯৮৮)। *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, সাহিত্যালোক, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), (১৯৮৭)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আন্দ্রে বেতেই, (১৯৯৮)। "পদমর্যাদা : মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস", *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

ইরফান হাবিব, (২০০৬)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, (২০০৬)। *বৈদিক সভ্যতা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

কঙ্কর সিংহ, (২০১০)। *আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন*, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা।

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, (২০০০)। *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, কলকাতা।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (২০০৪)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

দেবাশিস ভট্টাচার্য, (২০১০)। *বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা*, অক্ষর পাবলিকেশনস, ত্রিপুরা (ভারত)।

নীহাররঞ্জন রায়, (১৪০৭ বঙ্গাব্দ) । *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (১৯৯৮)। "জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা", *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (২০০০)। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, (২০০৫)। *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মনোহরমৌলি বিশ্বাস, (২০০৭)। *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা*, বাণীশিল্প, কলকাতা।

রণজিৎ গুহ, (২০০৪)। "একটি অসুরের কাহিনী", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪।

রফিকুল ইসলাম, (২০০১)। *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রমণীমোহন দেবনাথ, (২০০১)। *সিন্ধু থেকে হিন্দু*, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা।

রংগলাল সেন, (২০১৬)। প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রামশরণ শর্মা, (১৯৯৯)। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (১৯৯৮)। *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

হরিশংকর জলদাস, (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, (১৯৯৮)। "বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি", *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

Max Weber, The Religion of India, (1962), The Free Press of Glancoe, USA.